নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৈষম্যমুক্ত হোক

নাসরীন জাহান লিপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৯ অনুযায়ী রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হবে এবং রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে। সংবিধানিকভাবে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধানের ধারা ২৮(১) এ বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ২৮(২) ধারায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের অঙ্গীকার করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন। ধারা ৩২ এ প্রত্যেক নাগরিকের অর্থাৎ পুরুষের মতোই নারীরও জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এতকাল সংবিধানের এতসব ইতিবাচক কথা কাজীর গরু কেবল কেতাবে থাকার মতোই প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশের নারীদের জীবন বৈষম্যে ভরপুর। এর কারণ হিসেবে সংবিধানে 'সকল নাগরিক' বলে গড়পড়তা সম্বোধন থাকলেও স্পষ্টভাবে 'নারী'কে নিয়ে বলা হয়নি। 'নারী অধিকার' শীর্ষক আলাদা কোনো ধারা নেই সংবিধানে। নারীর অধিকার দিতে অনাগ্রহী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও সিস্টেম এর সদ্ব্যবহার করেছে পুরোপুরিভাবে। নারীর ক্ষমতায়নের নামে ফাঁকা বুলি আর অসত্য তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেও আসলে কী অবস্থায় আছে নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন, তার ব্যাখ্যা দিতে রাষ্ট্র পরিচালনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার বাস্তব অবস্থার দিকে নজর দেওয়া যায়। জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন বিষয়ে সংবিধানের ধারা ৬৫ (সংসদ প্রতিষ্ঠা) বলছে, পঞ্চাশটি আসন কেবল নারী-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। সংসদে তিনশত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যের পাশাপাশি ৫০ জন সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান আইনসভায় এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কথা ছিল। অথচ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যানুপাতে ও তাদের ভোটে এই সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নির্বাচিত (বা মনোনীত) করার বিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়টিই সংসদের জন্যে আলংকারিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সময়ে প্রভাবশালী পুরুষ নেতার স্ত্রী বা কন্যা এবং বিভিন্ন নায়িকা-গায়িকাদের এরকম কোটা সুবিধায় সংসদ সদস্য হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পার হলেও এভাবে নারী ক্ষমতায়ন কতটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে তা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে।

বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও সকলের জন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের কাজটিতে বিভিন্ন জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি বা প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আবশ্যকতা থাকলেও ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনার সময়ে এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়নি, খুবই অল্প সংখ্যায় যারাও ছিলেন তাদের মতের কোন গুরুত্ব সেখানে ছিল না। সেসময় বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ৩৪ সদস্যের কমিটিতে একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন রাজিয়া বানু। ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর দেওয়া বক্তৃতায় তিনি নারী অধিকার প্রসঙ্গে বলেন, "সংবিধানে লেখা আছে যে, নারীরা সমান অধিকার ভোগ করবে; কিন্তু ধর্মের অজুহাতে, কুরআন-সুন্নাহর অজুহাতে তারা সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন না। সুতরাং সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং তার দ্বারা বহু-বিবাহ, মৌখিক তালাক, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যেতে পারে।" বলাই বাহুল্য, সেই সংবিধানে রাজিয়া বানুর এই চাওয়ার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

পরবর্তীতে সরাসরি নির্বাচনে নারীদের নির্বাচিত হয়ে আসার চিত্রটি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে আশার সঞ্চার করতে পারেনি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে নারীর রাজনৈতিক সামর্থ্যকে খাটো করে না দেখে কেন নারীর প্রতিনিধিত্ব সাধারণ ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারছে না, তা নিয়ে ভাবা উচিত। সরকারি চাকরিতে নারী কোটার বিলুপ্তি

ঘটেছে। এখন সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন রাখার বিষয়টি উঠিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য প্রয়োজন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিতদের কার্যপরিধির ব্যাপ্তি বা দায়িত্বের বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আলাদাভাবে উল্লেখ নেই। সংবিধানে শুধু বলা আছে, সংরক্ষিত আসন থাকতে হবে, সেটির সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

সংসদে আইনপ্রণেতা হিসেবে একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মতো সমান অধিকার থাকে একজন সংরক্ষিত আসনের সদস্যের, তাকে সর্বোচ্চ দুটি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে বরাদ্দ পান নির্বাচিত সংসদ সদস্যের চেয়ে অনেক কম। একটি নির্বাচনী আসনে জনগণের ভোটে বিজয়ী সদস্যদের পাশাপাশি ওই এলাকার জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন ইস্যু সংসদে উপস্থাপন করার অধিকার রাখেন। বরাদ্দ না থাকায় এলাকার উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না, জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরাসরি ভূমিকা রাখার সুযোগ না থাকায় সংরক্ষিত আসনের সদস্য গুরুত্ব পান না। তারা নিজেরা কিংবা নারী সমাজকে কতটুকু ক্ষমতায়িত করতে পারেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন সময়। এরপরও ব্যক্তিগত লাভের আশায় বিগত সংসদগুলোতে পারিবারিক পরিচয়ে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাঁপ দেখেছি আমরা। ত্যাগী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের রাজনৈতিক দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার বহু কাহিনি উঠে এসেছে সংবাদ মাধ্যমে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পুরুষের পাশাপাশি সকল শ্রেণি-পেশা-ধর্মের নারীর স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব সবাই দেখেছে। নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের ত্যাগ এবং সাহসী ভূমিকা আলোচনায় ছিল। এই আন্দোলনের ফসল বিভিন্ন সংস্কার কমিশন বাংলাদেশের নারীর জীবনে যত প্রকার বৈষম্য রয়েছে অর্থাৎ সংবিধান, আইন ও সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর প্রতি যত ধরনের বৈষম্য রয়েছে, তার নিরসনের লক্ষ্যে বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারী সংস্কার কমিশন গঠন করে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও নারীর অধিতার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। নারী সংস্কার কমিশনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এসব নিয়ে আন্দোলনও করেছেন। তাঁরা বলছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন কিছু হলেও পরিবর্তন করে যায়, সে চেষ্টা তাঁদের থাকবে। নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশে নারী প্রতিনিধিত্ব ৪০ শতাংশের বেশি বা সমানসংখ্যক রাখা এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য ১০০ সংরক্ষিত আসন রেখে তাতে সরাসরি নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত ১০টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে ৬টি কমিশন প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সেসব প্রতিবেদনে নারীর বিষয়গুলো কীভাবে রাখা হয়েছে, সেটিও দেখছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য সারা দেশকে ১০০টি আসনে ভাগ করা হবে। এখানে সরাসরি ভোট হবে, প্রার্থী হবেন শুধু নারীরা। এখন স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে যেভাবে একটি সংরক্ষিত ওয়ার্ড হিসেবে নিয়ে নির্বাচনী এলাকা করা হয়, এটা হবে অনেকটা সে রকম। অন্যদিকে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ১০০টি সংরক্ষিত নারী আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি ভোটের প্রস্তাব করেছে। তাদের এ প্রস্তাবের অর্থ হলো, সংসদে একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হবে ৪০০টি। এর মধ্যে ১০০টি সংরক্ষিত থাকবে নারীদের জন্য। এ পদ্ধতি চালু হলে প্রথমবার দ্বৈবচয়ন বা অন্যকোনো পদ্ধতিতে ঠিক করা হবে কোন ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে ওই ১০০টি ছাড়া বাকি ৩০০ আসন থেকে ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এভাবে সংরক্ষিত নারী আসন ঘুরতে থাকবে।

বহুবছর বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারেনি। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সবাই নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন, এই আশাবাদ সকলের। সরাসরি ভোটে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হোক, নারীদের আসনকেন্দ্রিক বর্তমান পদ্ধতি থেকে বেরোতে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের নারী সমাজের পক্ষ থেকে দাবি আসছিল। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের কাছে বিভিন্ন নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি-দাওয়া দেওয়া হয়েছে, যার মূল কথা ‘সিলেকশন নয়, ইলেকশন চাই’।

সত্যিকার অর্থে নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও বিকল্প আসলেই নেই। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার ধারা চালু হলে বৈষম্যহীন বাংলাদেশে নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে, যা প্রকারান্তরে দেশ, আপামর জনগণ ও দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার